Department of Bengali

Haldia Government College

Debhog, Haldia, Purba Medinipur

Ref. No: BNGG/P/2022-2023/09 Date:

Project Completion Certificate

This is to certify that ....SUM.N MONDAL......................

with University Registration no...**1160366** of 2020-2021(session)

a student of Semester-VI has successfully completed the project work entitled ...... **Abhijit Sener Chotogalpo: Sanskarer Lokanubritti**......................

for partial fulfillment of B.A.(General) degree in the academic year 2021-2022.

It has been noticed that during the course, the candidate was regular and has a keen interest to the project work.

I wish him every success in life.

24-07-23

Project Supervisor

Assistant Professor
West Bengal Education Service
Department of Bengali
Haldia Government College

Head, Department of Bengali

Head
Department of Bengali
Haldia Govt. College
West Bengal Education Service

তথ্যসূত্র

১/ সেন অভিজিৎ, 'প্রত্নমাটি গল্প', কলিকাতা ৭০০০০৯, সুবর্ণরেখা, 2000 প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা : ১৮৮,

২/ সেন অভিজিৎ, 'প্রত্নমাটি গল্প', কলিকাতা ৭০০০০৯, সুবর্ণরেখা, 2000 প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২৪০,

৩/ তদেব পৃষ্ঠা : ২৪৫ - ৪৫,

4) তদেব পৃষ্ঠা : ২৪৫,

5) তদেব পৃষ্ঠা : ২,

6) তদেব পৃষ্ঠা : ২৪৯,

7) তদেব পৃষ্ঠা : ৪৫০

8) তদেব পৃষ্ঠা : ৯-১০

9) তদেব পৃষ্ঠা : ১১

10) তদেব পৃষ্ঠা : ৩৫৩-৩৫৪

11) তদেব পৃষ্ঠা : ৮৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প : সংস্কারের লোকানুবৃত্তি' আমার এই প্রকল্পমূলক কাজটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে গিয়ে যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সমূহ পরামর্শ, সাহায্য ও সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে যার নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন আমাদের মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অমিত পাত্র মহাশয়কে। এছাড়াও অন্যান্য অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা আমাকে সাহায্য, পরামর্শ, নির্দেশনা ও পরিচালনায় আমাকে সহযোগীতা করেছে। কৃতজ্ঞতা জানাই সেসব লেখক ও লেখিকাদের যাদের বিভিন্ন পুস্তক ও নথিপত্র আমার প্রকল্পের কাজে সাহায্য করেছে। আমি কৃতজ্ঞ বিভিন্ন গ্রন্থাগারিকদের যাদের সাহায্যে ও সহযোগীতায় আমার কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহপাঠী বন্ধু ও বান্ধবীদের যাদের সাহায্যে আমি এই গবেষণা ধর্মী কাজটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি।

পরিশেষে বলা যায় যে, আমার এই প্রকল্পমূলক কাজটি যদি বাস্তব অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে দেশের জনগনের কাছে সামান্য হলেও কাজে আসে, তবে এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করে আনন্দিত হব।

Suman Mondal

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	লেখক পরিচিতি	১
২.	ভূমিকা	২
৩.	অধ্যায় :	
	ক. অভিজিৎ সেনের ছোটগল্পে নগর জীবনে লোক সংস্কারের উপাদান	৩ - ৯
	খ. অভিজিৎ সেনের ছোটগল্পে ডাইনি সংস্কার	১০ - ১৫
	গ. অভিজিৎ সেনের ছোটগল্পে লোকপুরাণের প্রভাব	১৭
৪.	উপসংহার	১৮
৫.	তথ্যসূত্র	১৯
৬.	সহায়ক গ্রন্থ	২০

লেখক পরিচিতি

অভিজিৎ সেনের জন্ম, অবিভক্ত ভারতে ১৯৪৫ সালের ২৮ জানুয়ারি। জন্মস্থান পূর্ব বঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) বরিশাল জেলার কেওড়া গ্রামে। অভিজিৎ সেন কলকাতায় আসেন এক শতকের পাঁচের দশকের একেবারে শুরুতে। কলকাতা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া হয়ে শেষে তিনি কলকাতায় আসেন। এভাবে ঘুরে ঘুরে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করেন তিনি। পড়াশোনার শেষে তিনি কলকাতার একটি জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি শুরু করে। ১৯৬৩-৬৯ সাল এই ছয় বছর চাকরি করার পর, [illegible] কলকাতা ত্যাগ করে সেই সময় তিনি নকশাল পন্থী আন্দোলনে যোগ দেন। পরবর্তীতে রাজনীতি ত্যাগ করে উত্তর বাংলার বালুরঘাট শহরে বসবাস করলে আবার তিনি চাকরিতে যোগ দেন এবং সমবায় ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কে আবার প্রায় ৩৪ বছর চাকরির সূত্রে উত্তর বঙ্গের উত্তর দিনাজপুর, দঃ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলায় ব্যাপক ঘোরা ফেরা করেন। এইভাবে গ্রাম বাংলার সমাজ, অর্থনীতি ও বিভিন্ন সংস্কার ও বিভিন্ন লোকবৃত্তির সাথে পরিচিত হন। আর এই বিষয়গুলি তিনি তার বাংলা কথা সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে তুলেন আর লিখে ফেলেন বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটোগল্প। ১৯৮৫ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস "রহু চণ্ডালের হাড়"। এই উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্তিত বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার ২০০৫ সালে পান। তাঁর 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প' বইটিতে বিভিন্ন সমাজের গল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

ভূমিকা

মধ্যবিত্তের বিচিত্র সুখ-দুঃখ বিলাসের কচকচানিতে যখন ভরে উঠেছিল বাংলা, কথা সাহিত্যের ভাণ্ডার ঠিক তখনই অভিজিৎ সেন বেছে নিলেন আপন গল্প বিশ্বের ভূখণ্ডকে, তিনি বাংলা কথা সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যে একটি বিকল্প ধরন খুঁজতে চেয়েছেন আর এই বিকল্প ধরন থেকেই তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে আসে। তিনি বিভিন্ন সামাজিক, সাম্প্রদায়িকতা, সংস্কার মূলক প্রভৃতি বিষয় তাঁর গল্পে আলোচ্য বিষয় বস্তু হয়ে উঠেছে।

সমাজে বসবাস কারি লোকায়ত মানুষের বিভিন্ন ঘটনা লোক বিশ্বাস, লোক সংস্কার এর বাস্তবতার বসবাসকারী মানুষদের নিয়ে আসেন তাঁর সাহিত্যের আসর, তিনি তাঁর 'পঞ্চাশটি গল্প' সংকলনের ভূমিকায় বলেছেন -

"বিচিত্র বিশ্বাস, বিচিত্র আচার-বিচারে আবদ্ধ নানা অপরিচিত স্তরের মানুষ, এইসব গল্পের অধিকাংশ বয়ান সাহিত্যের অঙ্গনে ইতিপূর্বে অপরিচিত সেইসব মানুষকে নিয়েই।"

অপরিচিত মানুষদের সাহিত্যের অঙ্গনে নিয়ে আসার মাধ্যমে তিনি উন্মোচন করতে চান, আমাদের দেশের একটি বাস্তব পরিচয়।

প্রথম অধ্যায়

অভিজিৎ সেনের ছোট গল্পে নগর জীবনে লোক সংস্কারের উপাদান

-ঃ গল্পের নাম ঃ-

'ব্রাহ্মণ্য'
'কলাপাতা'
'নদীর মতো মানুষ'

৫ ব্রাহ্মণ্য? গল্পটিতে আমরা যারা আজকের দিনে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-যুবতী নিজেদেরকে দেখতে পাই, আমরা যারা একসময় ভাবি যে মন থেকে সমস্ত সংস্কার মুছে ফেলেছি কিন্তু তা যে আমাদের অবচেতন মনে রয়ে গেছে তার কথা বলেন অভিজিৎ সেন গল্পের দ্বিচারিতায়, গল্পটি গ্রামীন ব্যাঙ্কের এক ম্যানেজার নচিকেতা ও কেতকীর গল্প, গল্পটিতে একদিকে আছে রাইনগরের বাসিন্দা মহাদেব ও তার পরিবার, এমনকি ওই অঞ্চলের সমস্ত মানুষের কথা যারা লোক বিশ্বাস সংস্কারের জগতে নিত্যদিন বাস করে, অপর দিকে আছে শিক্ষিত মন নিয়েও অবচেতন মনে জমে থাকা সংস্কারের নিগড় থেকে বেরিয়ে আসতে না পারা নচিকেতা ও তার স্ত্রী কেতকীর কথা।

বরিন্দের মানুষ বিশ্বাস করে কোনো ব্রাহ্মণ তাদের বাড়িতে গেলে কিংবা ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে পারলে পুন্য অর্জন হয়, তাই নচিকেতাকে সেই আশাতেই মাহিষ্য মহাদেব তার বাড়িতে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রন করে, নচিকেতার কথাতেই বরিন্দের মানুষের সংস্কারের কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। :-

“কে জানত বরিন্দের এই দুর্গম অঞ্চলে পরিত্যক্ত নদীখাত, প্রাচীন জঙ্গল আর বাধার প্রেক্ষুর হয়ে ওঠা নদী-নালার বাঁকে বাঁকে মাহিষ্য, সদগোপ, কৈবর্ত, তন্তুবায়, তামলী, বারুই ইত্যাদি উত্তম ও মধ্যম সংস্কার সমাজের তলার গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ পুন্যার্জনের আকর্ষণ তৃষ্ণা নিয়ে আশির দশকেও অপেক্ষা করে আছে এই নচিকেতার জন্য।” ২

মহাদেব তার পরিবারের কোনো মেয়েকে পানের বরজে ঢুকতে দেয়না, কারন পানের বরজে মেয়েরা প্রবেশ করলে বরজের ক্ষতি হতে পারে অথচ ব্রাহ্মণ নচিকেতার স্ত্রী কেতকীকে পানের বরজের ঢুকতে দিতে কোনো বাধা নেই, মৃত্যু পথযাত্রী মহাদেবের স্ত্রীর মাথায় কেতকীর পায়ের ধুলা দেয় এবং প্রৌঢ়, তাদের বিশ্বাস শূদ্রানীর মাথায় ব্রাহ্মণীর পা ছোঁয়ালে সে স্বর্গবাসী হবে, এই হল বরেন্দ্রভূমির মানুষের বিশ্বাসের জগৎ, তারা এই বিশ্বাসের মধ্যে

নিত্যদিন বাস করে।

"ব্রাহ্মণ" গল্পের প্রধান বাচনটি হচ্ছে আমাদের অবচেতন মনের ভূমিতে সঞ্চিত জাত-পাতের সংস্কার যে কত গভীর তাকে প্রকাশ করা, যা প্রত্যক্ষ বাস্তবতার বিপরীত এবং আর এক বাস্তবতা। নচিকেতা বা কেতকী কেউই হয়তো কোনদিন জানতে পারত না যে তারাও বরেন্দ্র ভূমির মানুষের মতো মনের অবচেতনে লালন করে চলেছে হাজার বছর ধরে বয়ে আসা সংস্কারকে যদি না রাইনগরের মহাদেবের পরিবারের সঙ্গে তাদের পরিচয় হত।

নচিকেতা ব্রাহ্মণ সন্তান, কেতকী সদগোপ কন্যা, তারা সত্তরের দশকের কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় কাটিয়েছে কলেজ জীবন, সেই মতন তাদের বোধ-বুদ্ধি গড়ে উঠে, তারা রেজিস্ট্রি বিয়ে করে, সেখানে কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি, সমস্যা তৈরি হয় নচিকেতার বাড়িতে, নচিকেতার মা কেতকীর হাতে জল খেতে চান না, তিনি বলেন— "আমার সংস্কার তোমার হাত থেকে জল নিতেও আটকাবে।" নচিকেতা বলছে "আসলে মা বোধ হয় নিজেও জানতেন না যে কত গভীরে রয়েছে তার জাতের শিকড়।" এই জাতের শিকড় শুধু নচিকেতার মা কিংবা বাবার মধ্যেই প্রবল নয়, নচিকেতাও কেতকীর অবচেতন মনেও তা রয়েছে, তাদের অসবর্ণ বিয়ে নিয়ে তার বাবা কোনো কথা না বললেও "সংস্কারের আঘাত এড়াতে পারেননি," আর সেই জন্য "অন্তর্গত সংগোপনে নচিকেতা নিজেকে দায়ী করে বাবার অকাল মৃত্যুর জন্য।" নচিকেতা উপলব্ধি করতে পারলেও কেতকী পারত না, কিন্তু তার বোঝা উচিত "জাতপাতের শুনাপোকা বাঙালি চেতনাতেও খুব খুব কম দুর্বল নয়।" কেতকীর কিছু ভাবনাও সংলাপ থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি কেতকীর কেতাবী মস্তিষ্ক "জাতপাতের শুনাপোকা"কে পালন করে চলেছে, নচিকেতার মা তার হাতে জল খাননি বলে কেতকী আহত হয়, সে চায় যে নচিকেতা তার হয়ে মায়ের এই আচরণের কিছু

প্রতিবাদ করুক, কিন্তু নচিকেতা তা না করে কেতকীকে পাল্টা প্রশ্ন করে :

'যদি আমি না হয়ে কোনও হরিজনের সঙ্গে বিয়ে হত তোমার, জল খেতেন তোমার মা তার হাতে? তুলনার তীব্রতায় আঁতকে ওঠে কেতকী, তার পরে সে বলে আমরা হরিজন নাকি, কি সব বাজে বকছ?" ৩

কিংবা শৈল রায় যখন কেতকীকে 'বেজাতের মেয়ে' বলে তখন তার অভিমানবোধে আহত হয়, গল্পকারের ভাষায় :

"ওরা উচ্চ বর্ণের কায়স্থ ঘোষ, অথচ ওই লোকটা তাকে বেজাতের মেয়ে বলতে দ্বিধা করল না, তার অহঙ্কার অভিমানবোধে আহত হয়েছিল।" ৪

অথবা যখন জৈনেক সন্তোষ কুমার মিত্রের চিঠিতে কেতকীর প্রকৃত কুল পরিচয় প্রকাশিত হয় তখন কেতকীর উপলব্ধি :

"যেন ঘৃণা, যেন তা তার নৈতিক চরিত্রে নিন্দা আরোপের থেকেও অধিক শক্তিশালী, কোনও কলঙ্ক সারা দেহে মুখে কেউ নিক্ষেপ করেছে এমন অশুচি লাগাতে থাকে নিজেকে, ... তার মনে হতে থাকে এসব কথা বেশি হয় মিথ্যা নয়। তার বাল্যকাল থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত তাদের বাড়িতে জাতপাত বিষয়ক যাবতীয় কথাবার্তা, আচার আচরণ ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে এমন কতকগুলি সমস্যাকে দেখতে পায়, যে গুলোর সমাধান হয়নি।" ৫

কেতকীর এই সমস্ত কথাবার্তাই ভাবনা তার সংস্কারের শিকড়ের গভীরতাকে দেখিয়ে দেয়, সেই জন্যই সে ভয় পেতে থাকে, তার মনে 'আশঙ্কা জন্মায়', নচিকেতার পৈতে কিনে আনাতে ভাবতে থাকে — 'এবার থেকে আবার পিছনে হাঁটা শুরু করবে নাকি সে, পৈতে, তারমানে বামনাই।' কিংবা 'অশিক্ষিত চাষী পরিবার গুলোর অসম্মানে ভক্তি হওয়া', 'পায়ের ধুলো নেওয়া', 'নচিকেতা কি আবার উৎসে ফিরে যাবে নাকি?'

নচিকেতা উৎসে ফিরে যায় না, কিন্তু সংস্কারের উৎসমূলে তার অবস্থান, এই উপলব্ধি তার আছে, সেই জন্যই কেতকীকে সে বলতে পারে :

"আমরা কেউ এত সহজে পাল্টাই না, আমি কি জানতাম নিজেকে এভাবে আড়াল করবার এমন একটা মুহূর্ত আসতে পারে ভাবলে? ব্রাহ্মণ্য ভণ্ডামি, ব্রাহ্মণ্য অনাচার আমি অস্বীকার করলেই সমাজ থেকে উঠে যাবে না।" ৬

মহাকালের এই বাচনটি কেতকীর মতো কেতকী বুদ্ধির আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না বা বুঝতে চাই না, এই সত্যটিকে প্রকাশ করার জন্যই এই গল্পের পরিকল্পিত নির্মাণ করেছেন লেখক [illegible] সেন, যে নচিকেতা চেয়েছিল কলকাতায় তাদের ছেলে একজন যথার্থ আধুনিক মানুষ হোক, সেই নচিকেতা যখন উপলব্ধি করল যে আমাদের সংস্কারের মূল আমরা কোনভাবেই এড়াতে পারব না, তখনই 'কলকাতায় পড়ে থাকা তাদের কিশোরটির জন্য নচিকেতার মন হঠাৎ হু হু করে ওঠে।'

মহাদেব ও তার পরিবার যে লোকসমাজের মধ্যে বাস করে সেখানে ব্রাহ্মণে ভক্তি করা, ব্রাহ্মণীর পায়ের ধুলো নেওয়া, মেয়েদের পানের বরজে ঢুকতে না দেওয়া প্রভৃতি সংস্কারে বিশ্বাস থাকাটা স্বাভাবিক, কিন্তু নচিকেতা ও কেতকী যে পরিমণ্ডলে বাস করে তাদের যে শিক্ষা দীক্ষা, বোধ-বুদ্ধি সেখানেও তাদের চেতনার গভীরে জাতপাতের বিভাজনের সংস্কার কিভাবে কাজ করে যায় সেই সত্যটিকেই আমাদের জানিয়ে দেন কথাশিল্পী, তার জন্যই যে নচিকেতা কোনো সময়ে পৈতে ব্যবহার না করলেও বাড়ির মানুষের জন্য তাকে পৈতে ব্যবহার করতে হয়, শেষ পর্যন্ত এই গল্প আর নচিকেতা কেতকীর গল্প থাকে না, তা হয়ে ওঠে আমাদের সবার গল্প :-

= o =

'কলাবাতা' গল্পটিতে দেখা যায় যে এক জাতির উপর আর এক জাতির অভিমান, গল্পটি 'আমি'র জবানীতে বলা ব্যাঙ্ককর্মী হিন্দুর গল্প, হিন্দুর মধ্যে জাত্যাভিমানের সংস্কার প্রবল মাত্রায় দেখা যায়, যদিও সেই সময় রামমন্দির ও বাবরি মসজিদ বিতর্ক উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে জাত্যাভিমানের প্রাবল্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এসেছে হানিফ মাস্টার। এই গল্পে হিন্দুর যে পরিণতি দেখানো হয় তা খুবই দুঃখজনক।

ব্যাঙ্কে যাওয়ার পথে বাসের মধ্যে এক মুসলমান কিছু হিন্দুর গায়ে বমি করে ফেলায় হিন্দুর মনে হতে থাকে তার জাত নষ্ট হয়েছে, তাই সে বাড়ি গিয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এনে মাথা ন্যাড়া করে গোবর খেয়ে শাস্ত্র মতে 'প্রায়শ্চিত্ত' করেছে, তাতেও তাঁর মনে হতে থাকে যে সে শুদ্ধ হতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে শুদ্ধ হয়। আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের আগে এমনকি ঔপনিবেশিক শাসনের আমলেও এই ধরনের ধর্মীয় বিধি দেখা যেত, অথচ পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও আমরা যে আমাদের মধ্যে থেকে যাওয়া সংস্কারকে এড়াতে পারিনি, হানিফ মাস্টারের হিন্দুর সংস্কার দেখার পরিপ্রেক্ষিতে গল্পকথক 'আমি'র উপলব্ধি হয়:

"হানিফের শেষ কথাটা এবং হাসির মধ্যে যে শ্লেষ এবং ধর্ম সম্পর্কে যে অহঙ্কারের প্রদর্শন ছিল তা আমাকে বিদ্ধ করলে, আমি নিজে কোনও ধরনের ধর্মাচরণ করি না, আমার স্ত্রী সন্তানের এসবের বাইরে থাকে, তবুও হানিফের এহেন উক্তিতে আমি কেন আহত হলাম সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম না, তবে মাথায় মধ্যে কেমন ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল,"

এই উপলব্ধি শুধুমাত্র 'আমি'র একার নয়, তা আমাদের সবারই, সেই জন্যই ও আমরা আজও রামমন্দির বাবরি মসজিদের মতো বিতর্কে ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছি।

= ০ =

‘নদীর মধ্যে শহর’ এই গল্পটি একটি বিনয়ের গল্প, তবে এই গল্পে সমাজের দুই শ্রেণির মানুষের কথা বলা হয়েছে, গল্পকথক জয়দেবের শ্রেণি আর এক মেথরদের শ্রেণি, যে বিনয় শান্তিনিকেতন থেকে পড়াশোনা করেছে সেই বিনয় আজ মেথর পল্লীতে বাস করছে মেথরদের মেয়ে মহারানি বাঁশফোড়কে বিয়ে করে, মেথরদের বিয়ে করেও বিনয় কি মেথর হতে পেরেছে? মেথররা কি নিয়েছে নিজেদেরকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে? এই জিজ্ঞাসা থেকে গল্পটি গড়ে উঠেছে।

বিনয়ের বাবাও রক্ষিত ছিল, কিন্তু সে কাজ করে, তার বাবা সেই কাজ করেনি, বিনয়ের বাবার সময় থেকে বিনয়ের সমাজ শিক্ষা-দিক্ষায় দিক থেকে অনেকটা এগিয়েছে, কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে যে সংস্কার রয়ে গেছে তার থেকে কি আমরা এখনও বেরিয়ে আসতে পেরেছি? তাই মেথরের মেয়েকে বিয়ে করে কিন্তু হোঁচট খেতে হয় বিনয়কে, মেথরের মেয়েকে বিয়ে করায় সে তাঁদের পুরনো বাড়িতে ফিরতে পারেনা সমাজ ও স্বজনদের প্রবল বাধা থাকায়, শেষ পর্যন্ত তাকে উঠতে হয় ‘হাসপাতালের ঝাড়ুদারদের খোঁজাচোরা কোয়ার্টারে’।

বিনয় একদিন তার বাল্যবন্ধু জয়দেবের বাড়িতে পাড়ার ছেলে-মেয়েদের পড়ানোর জন্য চাঁদা চাইতে গেলে জয়দেব তাকে তাদের সমাজে ফিরে আসতে বলে তখন বিনয় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়:

“জয়দেব আমি আর তোমাদের লোক নই,... তোমরা আমাকে অনেক আগেই ত্যাগ করেছে, আমি মেথর, আমি এমন মলমূত্রের পাঁকে বসে খেতে পারি, নির্বিঘ্নে ঘুমাতে পারি কুকুরকে জড়িয়ে ধরে, স্ত্রীর সঙ্গে কলহ মারামারি করতে পারি, তাই তোমাকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে যেতে পারি, তাই তোমাদের ওটা পুরুষরাই পারে, যেমন আমার বাবা করেছিল, কিন্তু আমি তাকে ধরে এনে মেরে রক্তাক্ত করতে পারি এবং তারপরে মদ খেয়ে দুজনে হল্লা করতে পারি, এসমস্ত কিছুর পরে দুজনে উন্মাদের মত যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হতে পারি।” ৮

বিনয় এখানে লেখক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছে, কিন্তু সে তো পারেনি মহারানি বাঁকামেগড়েকে ফিরিয়ে আনতে, লেখকদের সমাজে কি তাকে গ্রহণ করতে পেরেছে? পারেনি, যদি বিনয় মেনে নিতে পারত কিংবা লেখকদের সমাজে বিনয়কে মেনে নিতে পারত তাহলে গল্পের শেষে আমরা বিনয়ের যে পরিণতি দেখতে পাই তা দেখতে হত না,

শুধুমাত্র বিনয়ের সমাজ বা লেখকদের সমাজই নয়, তার থেকেও খারাপ অস্থির অবস্থার বিরাজমান মানুষের বিনয়ের লেখকের মেয়েকে বিয়ে করা বা মহারানি বাঁকামেগড়কে বিয়ে করা মেনে নিতে পারে না, সেই কারণেই কি কি পদ্ধতে বাস করতে গিয়েও তাদের একসাথে হয়ে থাকতে হয়, একক্ষেত্রে এই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায় যে আমাদের প্রত্যেকেরই সামাজিক অবস্থান নির্দিষ্ট, আমরা যতই চেষ্টা করি না আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না, যেমনটা পারে বিনয় বা মহারানি বাঁকামেগড়ে আসতে পারি, এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন গল্প-কথক 'আমি' তাই তো তিনি বলেন —

"লেখক বিনয় যতই অহংকারের সঙ্গে বলে "আমি লেখক", কিন্তু লেখক সে হতে পারেনি আবার মহারানিকেও বের করে আনতে পারেনি ওই পরিমণ্ডল থেকে, এসব সম্ভবই না, সমাজে যার যেখানে অবস্থান তাকে সেখানেই থাকতে হবে, এটাই নিয়ম।" ৭

অসম্ভব সংবেদনশীল বিনয় ভুলে গিয়েছিল এই নিয়ম, কিন্তু বিনয় ভুলে গেলেও আমাদের সমাজ কাঠামো যে তাকে ভোলেনি, সেই কারণেই এমন মর্মান্তিক মৃত্যু হয় বিনয়ের।

= ০ =

দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিজিৎ সেনের ছোট গল্প ডাইনি সংস্কার

-: গল্পের নাম :-

'স্বেচ্ছাবন্দী'

'ডাইনি'

'মাটির বাড়ি'

'পাথরের জলের বিন্দু'

'শিকড়বাকড়'

-: প্রসঙ্গ উল্লেখ্য গল্প :-

'ডাইনি' - তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

'বায়েন' - মহাশ্বেতা দেবী

'ছেহাড্ডী': এই গল্পে দেখি ছেহাড্ডীর ভাসুরের ছেলে রেণ্টা ডাইন সন্দেহে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে, রেণ্টার বাড়িতে একের পর এক বিপদ ঘটে চলেছে, তার বড়ো ভাই খুন হয়, মা মারা যায়, বাবাও অসুস্থ হয়ে মারা যায়, একের পর এই সব ঘটনার ফলে রেণ্টা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, সে পাতারাম কবিরাজের কাছে যায়, পাতারাম কবিরাজ রেণ্টার পারিবারিক বিপদের কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা করে না, সে বলেছে সে তাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে থাকে, তাতে রেণ্টার নিঃসন্দেহ হয় যে তার কাকীই এই সর্বনাশ করেছে, তার পরেই সে তার কাকীকে ডাইনি সন্দেহে হত্যা করতে হয়।

'ডাইনি': এই গল্পেও আছে একই সমস্যার কথা, সোচের ছেলে হয়ে মারা যায়, তখন সোচের সন্দেহ হয় 'ডাইনের নজর না থাকলে এমন হয় না।' সে নিশ্চিত হবার জন্য গুনমান নয়ন হোড়ের কাছে যায়, নয়ন হোড় অনেক ক্রিয়া কর্মও অভিচার করে পান পাতার উপর, দালিকে পাতার উপর প্রতিফলিত মুখ দেখতে বলে, দালি মুখ দেখে নাম বলে তার ভাসুর সহা কিস্কুর, আর কান্দরেসরা নয়ন হোড়ের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে বলে, 'এ হতে পারে না, এ অসম্ভব আমি মানি না।' তখন আরও নিঃসন্দেহ হবার জন্য ডাকিনী বিদ্যাবিশারদ মিমন হেমব্রমকে নিয়ে আসা হয়, সেও একই নাম করে, তখন সোচ আর দাদা সহা কিস্কুকে হত্যা করতে চাই, সহা কিস্কু তার বন্ধুর বাড়িতে থাকতে পারে না, শেষ পর্যন্ত সেও বিশ্বাস করতে থাকে যে সে একজন ডাইন এবং উন্মাদের মতো হয়ে যায়, একদিন রাতে বাড়িতে ফিরে এলে সোচ তাকে হেসো দিয়ে কেটে ফেলে, তখন সাঁওতাল পাড়ার বৃদ্ধরা বলে 'তবে? অর্থাৎ সহা কিস্কু প্রকৃতই ডাইন ছিল এবং সোচ তার উপযুক্ত সাজা দিয়েছে, যেমনটা রেণ্টার সমাজের সবাই চেয়েছিল ছেহাড্ডীর বলি।

'ছেহাভ্রী' ও 'ডাইন' গল্পদুটি যে পরিবেশে রচিত সেই সমাজের মানুষজন ডাইনে বিশ্বাস করে, 'ছেহাভ্রী' গল্পের কয়েকটি সংলাপ উদ্ধৃত করে তাদের বিশ্বাসটা দেখাতে পারি; –

" – কাকীকে মারার জন্য তোর দুঃখ হচ্ছে না? আফসোস?
– না
– কাকী মানুষ না, ডাইন।.....
– ছেহাভ্রী, কোনও মানুষ ডাইন হতে পারে, একথা তুমি বিশ্বাস কর?
– হ্যাঁ, বিশ্বাস করি। আমার আত্মীয়েরা সবাই আড়ালে ডাইন বলত, আমি সে কথা বিশ্বাস করতাম।.....
– আচ্ছা জলনা তুমি ডাইন বিশ্বাস কর?
– করি স্যার।.....
– ছেহাভ্রীর পক্ষে ডাইন হওয়া সম্ভব, একথা তুমি বিশ্বাস কর?
– ছেহাভ্রীর পক্ষে ডাইন হওয়া সম্ভব, স্যার।" ১০

এখানে গুণীনদের কথা বাদ দিয়েছি কেননা তারাই তো রায় দেয় কে ডাইন আর কে ডাইন নয়, এবং প্রতিকারের চেষ্টাও করে। আমরা যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তারা জানি ডাইন বলে কিছু নেই, তবুও কি মানুষ তার মন থেকে এই বিশ্বাস সরাতে পেরেছে, পারেনি, আর পারেনি বলেই আজও সহা বিসুকাদের মতো মানুষদেরকে ওঝাদের হাতে বলি হতে হয়।

'মাটিরবাড়ি' এই গল্পে লোকসংস্কারের ব্যবহার প্রয়োগ দেখতে পাই। মোহনলালের জমি জায়গা বাড়ানোর কৌশলের কথা আছে এই গল্পে, সে তার পাশের জমিতে নিজের জমি করার জন্য দুই জমির মাঝ থেকে মাটি তুলে নানা ক্রিয়া করে এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দেয়। এমন দুজন দুজনার শত্রু হয়ে গ্রাম ছেড়ে দুই দিকে চলে যায় সেই জমি মোহনলালকে সামান্য দামে বিক্রি করে। 'মোহনলালের জমি এইসব বেড়েছে।'

মোহনলাল তার পরিবারের সুরক্ষার জন্য বড় ছেলের সদ্যোজাত শিশুর উপর নানা আভিচারিক ক্রিয়া করে গুনমানির সাহায্য, তারপরে সেই শিশুকে মাটির হাঁড়ির ভেতর পুরে সরা দিয়ে মুখ এঁটে মাটির নীচে পুঁতে দেয়, কারন তাদের বিশ্বাস এই সদ্যোজাতের 'প্রেতাত্মা এক পুরুষকাল' তাদের 'ধনসম্পত্তি বাড়াবে এবং রক্ষা করবে।' পরের পুরুষের জন্য তাদের আবার এই কাজ করতে হবে।

'পাথরে জলের বিন্দু' এই গল্পেতে একই পরিণতি দেখতে পাই, কৈলাস পাহান আলোচনা, দানীদের গ্রামে বাস করতে থাকে পুষ্পা নামের এক মেয়েকে নিয়ে, কৈলাস পাহান কবিরাজি জানে, দানীদের গ্রামে সবাই বিশ্বাস করে 'এসব কবিরাজেরা হামেশাই ডাইন কিংবা মোকাসিন হয়।' দানী তার স্ত্রীর জন্য কৈলাস পাহানের কাছে ওষুধ আনতে গিয়ে পুষ্পার দ্বারা ধর্ষিত হয়। এই ঘটনার কিছু দিন পরে 'দানী একেবারে নিঃসন্দেহ হয় প্রেসার করাতে বসে,' অর্থাৎ কৈলাস পাহান তার পরিবারের উপর মোকাসিন করেছে, তাদের এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যখন 'আবিষ্কার করে বাড়ি সংলগ্ন তেমাথা কলার খোলায় কিছু ফুল, আতপ চালের গুঁড়া দুটি কোলার মধ্যে ইত্যাদি আভিচারিক নিদর্শন,' তখন গাঁয়ের সমস্ত মানুষ মিলে কৈলাস পাহানকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই কাজে করে আলোচনাতে দানী, মানুষকে মোকাসিন সন্দেহে হত্যা করা এবং কারন সন্ধান করতে গিয়ে

গল্পকারকে বলতে শুনি ;—

"আমাদের দানী এবং তাদের স্বজনেরা জীবনের কত কল্পনা, বেঁচে থাকা বড় সংশয়ের, জীবন অসংখ্য কারণে নিরাপত্তাহীন এবং সেই কারণগুলি যেনতে অন্য অদৃশ্য উৎস আছে, সেই উৎস শুধু অদৃশ্য নয়, অন্ধকার এবং আদিম," ২২

দানীকে আমাদের সমাজের সবাই জানে এই রকম কাজ করার জন্য ধরা পড়লে তাদের কারোর শাস্তি ভোগ করতে হবে; তবুও তারা সেই কাজ করে, শেষে দেখতে পাই ধরা পড়ার পর দানী কাঠের শাস্তি সহ্য করতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

'শিকড় বাকড়' গল্পে দেখতে পাই কবিরাজের চিত্র, আমাদী সুরজ্জুনকে রক্ষা করার জন্য তেলপড়া, চিনিপড়া, নুনপড়া মিশিয়েছে তার খাবারে। এমনকি সুরজ্জুনকে পাওয়ার জন্য সে 'নিরাবরণ' হয়ে বুড়ির থানে মানত করতে, শেষ পর্যন্ত সুরজ্জুন চেষ্টা করলেও সে পারে না, সে দেখে তার জামার পকেটে গাছ, সেই গাছ ফেলে দিয়ে সে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় ফিরে আসতে পারে।

◉ প্রসঙ্গ উল্লেখ্য গল্প :-

অভিজিৎ সেনের ছোট গল্পে সমাজে ডাইনিকে বিভিন্ন কুসংস্কারের আলোচনা করতে গিয়ে আমি বাংলা কথা সাহিত্যে বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'বাঁয়েন' মহাশ্বেতা দেবী, এই গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ;—

'ডাইনীর বাঁশি' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গল্পে যেমন একটি চিত্রণ দেখা যায়, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মধ্যে যা মেয়েটিকে ডাইনি ভাবতে বাধ্য করেছিল, তারই দীর্ঘশ্বাস রয়েছে সম্পূর্ণ গল্প জুড়ে। লোকেরা তাদের বিশ্বাস আর আশে পাশে ঘটতে থাকা দুর্ঘটনাগুলো কাকতালীয় ভাবে মিলে গেল বৃদ্ধাকে নিজেকে ডাইনী ভাবতে

শুরু করে, যেটা সাওতা বিভিন্ন দুর্ঘটনার কারণ প্রচ্ছন্নভাবে বা অচেতন ভাবে লেখক পাঠকদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টাও করেননি, গ্রামের লোকেরা যে বিশ্বাসের আস্থাটিই এখানে উঠে এসেছে, সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে, ডাইনী হিসাবে পরিচিত বৃদ্ধার নিজের বিশ্বাস, লৌকিক জীবনের চিত্র রূপায়িত করতে গিয়ে লেখক জীবনের নানা বিশ্বাস, মূল্যবোধ এসবের ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, সংস্কার এই সবই নিয়ে জীবন, লোক জীবনের চিত্র শুধুমাত্র মানুষের যে দৈনন্দিন জীবন বাস্তবতা নয়, বরং ভিন্নতর জীবন বা চিত্র ভিন্ন মূল্যবোধ বা অতিপ্রাকৃতিক যারা বাইরে জীবন পদ্ধতি ও জীবন যাত্রার অংশ বা এখনও সমাজ থেকে মুক্ত হয়নি।

'বায়েন' মহাশ্বেতা দেবীর 'বায়েন' গল্পে চন্ডী তার সমাজপ্রদত্ত বায়েন পরিচয় নিয়ে প্রথম দিকে নানা আপত্তি জানিয়েছে স্বামী ও সমাজ সকলকে সে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে সে বায়েন নয়, কিন্তু তার স্বামী বা সমাজ তার এই আবেদনে সাড়া দেয়নি, বায়েনকে যেহেতু হত্যা করতে নেই, তাই চন্ডী বায়েনকে তার সমাজ ও গ্রামের বাইরে বের করে দেয়।

'বায়েন' গল্পে চন্ডীর জীবিকার বংশগত উত্তরাধিকার ছিল কাঁচা খেজারের কাজে, পেশাগত এই উত্তরাধিকার এক একটি শ্রেণি বা পরিবারকে বংশানুক্রমে প্রান্তবাসী করে রাখে, আর এই পেশাকে ঘিরে সংস্কারের শাসনকে বলবৎ রাখার জন্য সমাজ তৈরি করে দেয় এক একটি পুরাকথা, চন্ডীর ক্ষেত্রে সেই পুরানকথা হল সেই সকল শ্মশানের একচ্ছত্র অধিকার লাভ করেছে বংশের একমাত্র উত্তরাধিকার হবার সূত্রে পিতার মৃত্যুর পর সংস্কারের ফাঁদে পা দিয়ে চন্ডীকে কাঁচা খ্যারের কাজ করতে হয়, কিন্তু সন্তান জন্মাবার পরে চন্ডী এই পেশা থেকে মুক্তি চায়, ইতিমধ্যে চন্ডীর ননদের মেয়েটিও

বসন্ত রোগে মারা গেলে চণ্ডীর অসুখ ছুটে সাবিত্রির বিয়েতে গ্রাম কথা ওঠে, কিন্তু অসহায় চণ্ডী তার বংশগত জীবিকা ত্যাগের পর চণ্ডীর মান এবং আত্মসম্মানে টানাপোড়েনের সূচনা হয়, পেশাগত জীবনের পবিত্র কর্তব্যবোধ তাকে সংকটগ্রস্ত করে তোলে, ফলে একরাতে শেয়ালের ডাক বন্ধ হতেই চণ্ডী কবরস্থানে ছুটে যায়, কাঁটাগাছের ঝোপ দিয়ে সে কবরস্থানের গর্ত ঢাকার চেষ্টা শুরু করে, যাতে শেয়ালগুলো গর্ত থেকে মরা তুলতে না পারে, স্বামী মলিন্দর এবং সমাজের মানুষরা বিশ্বাস করে চণ্ডী বাঁয়েন হয়েছে, বৃষ্টি ভেজা চণ্ডীর বুকের আঁচল দেখে মালিন্দর নিশ্চিত হয়ে মনে করে যে চণ্ডী তার মৃতপুত্র সন্তানের কোনো তাকবীরি শিকড়ে খাওয়াতে এসেছে, ফলে মালিন্দর নিজের স্ত্রীকে বাঁয়েন বলে চিহ্নিত করে সমাজের বাইরে বের করে দেয়, ও অঞ্চলে একা মালিন্দর ছাড়া অন্য কেউ নাম সই করতে পারে না, তাই সে কবরস্থানের ডোম থেকে মজুমদারের কোম্পানিতে বিয়াল্লিশ টাকার মাইনের কাজ পেয়েছে, সরকার বাবুর সঙ্গে যোগসাজশে সে বেওয়ারিশ মড়ার হাড়, খুলি, কঙ্কাল বেচার ব্যবসায় জড়িত এবং সেই উপরি টাকা সুদে সুদে খাটিয়ে সে কয়েকটা শুয়োর কিনেছে, মহকুমায়, পাড়ায় ও সম্মানী মানুষ, অর্থ সামাজিক স্তরে খানিকটা উঠে আসা এই মালিন্দর ও তার বিশ্বাসের সংস্কার ভাবতে পারে না,

গল্পের কাহিনীক্রমে যখন স্কুলে পড়া পুত্র ভগীরথ চণ্ডীকে নিজের মা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না এবং অসহায় সমাজ বিচ্ছিন্ন মার সঙ্গে সে যোগাযোগ রক্ষা করতে চায়, মাতৃ সন্তানের এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সন্তানের সহানুভূতি দেখে চোখে জল আসে, চণ্ডী তার বাঁয়েন পরিচয়কে প্রথমে মেনে নিতে না চাইলেও পরবর্তী সময়ে সে নিজেকে বাঁয়েন বলেই ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছিল, কিন্তু গল্পের শেষ পর্যায়ে সে ডাইন সংস্কার বদ্ধ থাকলেও তার নারী সত্তা ও মাতৃত্ব আবার জেগে ওঠে, সে স্বামীর উপর কর্তব্য গাফিলতির জন্য অভিমান করে, কারণ ভগীরথকে সমাজে না রাখলে

বাঁয়েনের নজরে তার সর্বনাশ হবে, পুত্রকে সামলাবার দায়িত্ব স্বামীকে স্মরণ করাতে গিয়েই চন্ডী নিজেকে বৃহত্তর এবং সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে নিয়ে আসে, নিজের বাঁয়েন পরিচয়কে কাজে লাগিয়ে সে দুর্বল দুর্দম এবং ট্রেন ডাকাতি রুখে দেয়।

গল্পের সব থেকে মর্মান্তিক ঘটনা হল - যারা নিজেকে ভদ্র সমাজ থেকে নির্বাসিত তারাই আবার নিজেদের অবগুনকে এই নিজেদের সামাজিক বন্ধন থেকে বের করে দেয়, মনুষ্য সমাজের প্রান্তদেশে যাদের অবস্থান, তারা যখন কাউকে বার করে দেয়, সেই নির্বাসিতা যেন মনুষ্যেতর শ্রেণীতে গিয়ে পড়ে, নিজেকে ধীরে ধীরে সমাজ বহির্ভূত স্থানে বহির্ভূত স্থান মানিয়ে নেয়, কেননা আমাদের এই সমাজ খুব সংস্কারে জর্জরিত।

এই কুসংস্কার এমন একটি ব্যাধি যে মানুষকে সমাজ বহির্ভূত করে যে, সন্তানের থেকে আলাদা করে দেয়, প্রিয় মানুষের থেকে আলাদা করে দেয়, তাই এই গল্পেতে সেই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যা একটি আধুনিক, সভ্য সমাজের পরিচয় নয়।

তৃতীয় অধ্যায়

অভিজিৎ সেনের ছোট গল্পে লোক পুরাণের প্রভাব

-: গল্পের নাম :-

'লখিন্দর ফিরে আসে'

"লখিন্দর ফিরে আসবে" মঙ্গল কাব্যের সংস্কারকে নিয়ে রচনা করেছেন এই 'লখিন্দর ফিরে আসবে' এই গল্পের প্রধান চরিত্র কমলবাবু, তার যে গুনমানির নানা অবিচারিক ক্রিয়ার কথা বলাই গল্পকারের উদ্দেশ্য, মঙ্গল কাব্যের যে বাস্তবতা সেই বাস্তবতা আমাদের সমাজে আজও বর্তমান সেই দিকটিকেই তিনি এই গল্পে প্রকাশ করেন। আত্মীয়ের বাল্যবন্ধু কমলসাধু, তাকে সে নানাভাবে তাচ্ছিল্য করলেও যখন শুনল যে কমলসাধু তিন দিন এর সাপে কাটা বাসি মরাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য নদীর ধারে নানা অভিচার শুরু করেছে তখন কিন্তু তিনিও দেখতে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত মনে মনে বলতে বাধ্য হন - 'জিয়াও, জিয়াও, সাধু তুমি ওকে জিয়াও।' পরের দিন শুনতে পাওয়া যায় যে কমলসাধু মরাটিকে বাঁচিয়ে তুলেছে আর তা 'হাজার হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে' এই গল্পে আমরা নবজন্ম ফলের কথাও পাই এবং তার জন্যই প্রায়শ্চিত্ত করার কথাও রয়েছে।

উপসংহার

অভিজিৎ সেন প্রতিকূল নানা পরিস্থিতিতে মানুষের অসহায় জীবনকে দেখেছেন। গ্রামীন জীবনের প্রতিটি পলক অনুপলক লক্ষ করেছেন, তিনি একজন ব্যাঙ্কের কর্মচারী হিসেবে। তিনি জীবনকে ব্যক্তিক ভাবে নয়, রাজনীতি - সমাজনীতি - অর্থনীতির বহুমাত্রিক ভাবে ছড়িয়ে দেখেছেন। তাই তাঁর ছোটগল্পগুলি আমাদের উৎসভূমিকে চিনিয়ে দেওয়ার বয়ান। তিনি এই বয়ান নির্মান করেন প্রধানত বয়ানের বিপরীতে। এই বয়ানে তাই আধুনিকতা সম্পর্কে সংশয় ও জিজ্ঞাসা থেকেই যায়। আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে নানা সংস্কার বিশ্বাস লৌকিক - অতিলৌকিকের অসংখ্য উপাদান। অভিজিৎ সেন তাকে উপেক্ষা করেননি বরং তাকেই করেছেন গল্পের বিষয়। তিনি তাঁর গল্পে লোকসংস্কার ও লোক বিশ্বাসকে রূপায়নের মাধ্যমে সন্ধান করেছেন আমাদের অতীত ইতিহাসকে। তিনি 'মিথ ও লোককথার সম্ভবনা' প্রবন্ধে লিখেছেন:

"মিথ ও লোককথার মধ্যে একটা গোটা সমাজের সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে খুঁজলে পাওয়া যাবে বলে আমারও বিশ্বাস। আমাদের লেখালেখির বিষয়বস্তু এবং চরিত্রগুলোকে এভাবে চিনবার এবং চেনাবার চেষ্টা খুব একটা বেশি হয়নি।"

বর্তমান আধুনিকতায় আধুনিক হয়েছি ঠিক কিন্তু সেই আধুনিকতা বাইরে। আমাদের ভেতরটা আজও বিভিন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাই আমাদের উচিত আমাদের সমাজকে এই সংস্কার মুক্ত করা। এই জন্য আমি অভিজিৎ সেনের লেখা বিষয়ের মধ্য দিয়ে এই জগতকে এবং তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম।